হীরে কারিগর

এইচ জি ওয়েলস

হীরে কারিগর

(The Diamond Maker)

['The Diamond Maker' ১৮৯৪ সালের আগস্ট মাসে 'Pall Mall Budget' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ সালে লন্ডনের 'Methuen & Co.' থেকে প্রকাশিত ওয়েলসের প্রথম ছোটগল্পের সংকলন 'The Stolen Bacillus and Other Incidents' তে গল্পটি স্থান পায়।]

চ্যান্সারি লেনে কাজে আটকে গিয়ে দেরি হয়ে গিয়েছিল। রাত নটা নাগাদ মাথা টিপটিপ করতে লাগল। আমোদ-আহ্লাদ অথবা নতুন কাজ, কোনওটাই আর ভালো লাগছিল না। তাই এসে দাঁড়িয়েছিলাম নদীর পাড়ে–ব্রিজের ওপর। প্রশান্ত রাত। নদীর দুপাড়ে ঝলমল করছে অজস্র রঙের আলো। কালো ময়লা জলের ওপর হরেক রঙের প্রতিফলন। লাল, জ্বলন্ত কমলা, গ্যাস-হলুদ, বিদ্যুৎ-সাদা, বিবিধ ছায়ামিশ্রিত অবস্থায় রকমারি রং ফুটিয়ে তুলেছে দুপাড়ে। মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত আকাশের বুকে ওয়েস্টমিনস্টারের ধূসর চূড়া। নদীর জল প্রায় নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ হচ্ছে মৃদু ছলছলাত শব্দে, ভেঙে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে জলের ওপরকার রঙের প্রতিবিম্ব।

পাশেই ধ্বনিত হল একটা কণ্ঠস্বর, চমৎকার রাত।

মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম বক্তাকে। আমার পাশেই রেলিং-এ ভর দিয়ে চেয়ে আছে মরণ কালো জলধারার দিকে। দেখা যাচ্ছে তার মুখের পার্শ্বরেখা। মার্জিত মুখ। অ-সুদর্শন নয়, কিন্তু মেচেতা-পড়া। বিলক্ষণ বিবর্ণ। কোটের কলার উঁচু-করা। পোশাক আর মুখ

দেখলেই বোঝা যায় সমাজে তার স্থান খুব উঁচুতে নয়। নিশ্চয় ভিক্ষে চাইবে গায়ে পড়ে আলাপ করার পর।

তাকিয়ে ছিলাম কৌতূহলী চোখে। ভিক্ষুক দুশ্রেণির হয়। এক শ্রেণির হয় গল্পবাজ, কথার ধোকড়। বোলচাল শুনিয়ে হাত পাতে, এক পেট খাওয়ার পয়সা পেলেই খুশি। আর-এক শ্রেণির মুখে খই ফোটে না, নিজের মতো হাত পেতেই খালাস। এই লোকটার কপালে আর চোখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ লক্ষ করে আঁচ করতে পারলাম, ভিক্ষাবৃত্তি ঘটবে কোন পথে।

বললাম, খুবই চমৎকার, তবে আপনার আর আমার পক্ষে নয়, অন্তত এই জায়গায়।

নদীর দিকেই চোখ রেখে সে বলল, তা নয়। তবে এই মুহূর্তে বড় ভালো লাগছে।

একটু থামল। ফের বললে, লন্ডনের কাজকারবার, উদবেগ, দুশ্চিন্তা নিয়ে সারাদিন কাটানোর পর মাথাটাকে জিরেন দেওয়ার পক্ষে এমন খাসা জায়গা আর নেই। দুনিয়াটাই ধকল সওয়ার জায়গা, উদয়াস্ত মেহনত করতেই হবে, নইলে ঠাঁই নেই কোথাও। ধকল যখন ক্লান্তি আনে দেহে-মনে, তখনই মানুষ ছুটে আসে এমন নিবিড় শান্তির জায়গায়, যেমন আপনি এসেছেন। কিন্তু আমার মতো ক্লান্ত আপনি নন। আমার মতো মাথার ঘায়ে কুকুর-পাগল অবস্থা আপন হয়নি। আমার মতো হেঁটে হেঁটে পায়ের তলায় ফোঁসকা তুলে ফেলেননি। আমার মতো মস্তিষ্কের প্রতিটা কোষকে বেদম করে ফেলেননি। মাঝে মাঝে মনে হয় কেন এত খেটে মরছি? লাভ কী? একখানা মোমবাতির দামও উঠবে কি না সন্দেহ। ইচ্ছে হয় নাম, যশ, প্রতিপত্তি, সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মামুলি

কারবার নিয়ে থাকি। কিন্তু পারি না। কেন জানেন? উচ্চাশা যদি ত্যাগ করি, শেষ জীবনটা অনুতাপে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাব।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম লোকটার দিকে। এরকম দারিদ্র-বিশুষ্ক মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। শতচ্ছিন্ন পোশাক রীতিমতো ময়লা। দাড়িগোঁফ কামানোর পয়সা জোটেনি। চুলে চিরুনি পড়েনি। দিন সাতেক ডাস্টবিনে শুয়ে ছিল যেন। কিন্তু লম্বা লম্বা কথা কী! বিশাল কারবার চালিয়ে হেদিয়ে পড়েছে। ইচ্ছে হল, অট্টহেসে থামিয়ে দিই বোলচাল।

ব্যঙ্গের সরে তাই বলেছিলাম, উচ্চাশা আর সামাজিক প্রতিপত্তি মানুষকে খাটায় ঠিকই, কিন্তু ক্ষতিপূরণও করে দেয়। প্রভাব, সৎ কাজের আনন্দ, গরিবদের সাহায্য করার সুযোগ, মাতব্বরির সুবিধে

কথাগুলো বলবার সময়ে একটু যে অনুতাপ হয়নি তা নয়। দারিদ্রকে এভাবে কশাঘাত করা কুরুচির পরিচয়। কিছু লোকটার চেহারা আর চ্যাটাং চ্যাটাং কথার বৈষম্য তাতিয়ে তুলেছিল আমাকে।

সে কিন্তু শান্ত-সংযত মুখে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল আমার পানে।

তারপর বললে, ভুল করেছি আপনাকে বিশ্বাস করাতে গিয়ে। কেউ করেনি, আপনি তো করবেনই না। পুরো ব্যাপারটা এমনই উদ্ভট যে, গোড়া থেকে যদি শোনেন, হেসে খুন হবেন। কিন্তু ঠিক সেই কারণেই বলব আপনাকে নিজের নিরাপত্তার জন্যেই বলব। বিশ্বাস করলেই তো বিপদে ফেলবেন। সত্যিই বিরাট কারবার নিয়ে নাকানিচোবানি

খাচ্ছি আমি– সে যে কত বড় ব্যাবসা, কল্পনাও করতে পারবেন না। এই কারবারই কিন্তু এখন ঝামেলায় ফেলেছে আমাকে। খুলেই বলি... আমি হীরে বানাই।

বেকার রয়েছেন মনে হচ্ছে?

সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙে পড়ে আমার এই টিটকিরির জবাবে–দোহাই আপনার, আর খোঁচা মারবেন না। অবিশ্বাসের হাসি আর সহ্য করতে পারছি না। বলতে বলতে ঘচাঘচ করে খুলে ফেলল কোটের বোতাম। সুতো দিয়ে গলায় ঝোলানো একটা ক্যানভাসের থলি টেনে নামিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল তার মধ্যে। টেনে বার করল একটা বাদামি নুড়ি। আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে চাপা গলায়, জানি না এ জিনিস চেনবার বিদ্যে আপনার আছে। কি না। দেখুন, দেখুন।

বছরখানেক আগে হাতে একটু সময় পেয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম। লন্ডন সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেছিলাম। পদার্থবিজ্ঞান আর খনিজবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্যি ছিল সেই কারণেই। বাদামি নুড়ির মতো বস্তুকে হাতের তেলোয় নিয়ে দেখেই খটকা লাগল এই বিদ্যেটুকু জানা ছিল বলেই। জিনিসটাকে গাঢ় বর্ণের আকাটা হীরের মতোই দেখতে। কিন্তু বেজায় বড় হীরে। আমার এই বুড়ো আঙুলের মতো বিরাট। উলটে-পালটে দেখলাম, রত্নের রাজা হীরের যেমন ছকোনা আকৃতি থাকে, নুড়িপাথরটার আকৃতিও হুবহু তা-ই। গোলাকার মুখগুলোও অবিকল হীরের মুখের মতো। পেনশিল-কাটা ছুরি ছিল পকেটে। বার করলাম। ধারালো ফলা দিয়ে কাটতে গেলাম–আঁচড় পড়ল না। গ্যাস ল্যাম্পের দিকে ঝুঁকে পড়ে নুড়িপাথর দিয়ে কবজি-ঘড়ির কাঁচে আঁচড় দিতেই কাচ কেটে গেল সহজেই। কৌতূহল মাথাচাড়া দিল মগজের মধ্যে তৎক্ষণাৎ।

চোখ তুলে বললাম, হীরে বলেই তো মনে হচ্ছে। হীরেই যদি হয়, তাহলে বলব রাজা হীরে। পেলেন কোথায়?

বললাম তো, নিজে বানিয়েছি। দিন, আর দেখতে হবে না। এস্তে অদ্ভুত হীরেটাকে থলিতে পাচার করে কোটের বোতাম এঁটে দিল হীরে কারখানার মালিক। পরক্ষণেই বললে ব্যগ্র চাপা কণ্ঠে, একশো পাউন্ড পেলেই বেচে দেব, এখুনি।

শুনেই আবার ফিরে এল মনের সন্দেহ। কে জানে, হীরের মতো দেখতে হলেও জিনিসটা আসলে হয়তো একতাল কোরানডাম ছাড়া আর কিছুই নয়। হীরের মতোই প্রায় কঠিন বস্তু এই কোরানডাম দিয়ে হীরেপ্রেমিকদের ঠকানোর কত কাহিনি শুনেছি। কোরানডাম যদি না-ও হয়, সাচ্চা হীরে কেউ মাত্র একশো পাউন্ডে বেচে? তা ছাড়া পেল্লায় এই হীরে এই হাঘরেটার কাছে এল কীভাবে?

নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম তার চোখের দিকে। দেখলাম, নির্ভেজাল ব্যগ্রতার রোশনাই হীরের মতোই ঝকমক করছে চোখে। জহুরি যেমন জহর চেনে, আমিও তেমনি ওই চাহনি দেখে নিমেষে বুঝলাম জোচ্চোর নয়, রাতের ভবঘুরে, খাঁটি হীরেই বেচতে চায়। কিন্তু কেনবার মতো পয়সা কই পকেটে? গরিব মানুষ আমি। একশো পাউন্ড বার করে পথে বসব নাকি? তা ছাড়া গ্যাস লাইটের আলোয় ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরা এক হাঘরের কাছ থেকে এত দামি হীরে কেউ কেনে? শুধু মুখের কথায় বিশ্বাস করে?

অথচ, খাঁটি হীরেই দেখলাম এইমাত্র। কয়েক হাজার পাউন্ড দাম হওয়া উচিত। তা-ই যদি হয়, কোনও রত্ন-পুস্তকে পেল্লায় সাইজের এই হীরের কথা তো চোখে পড়েনি

আমার। কেন? আবার জাল হীরের রাশি রাশি গল্প ভিড় করে এল মাথার মধ্যে। হীরে কেনার চিন্তা শিকেয় তুলে রাখলাম তৎক্ষণাৎ।

শুধালাম, পেলেন কোথায় এ জিনিস?

বানিয়েছি।

নকল হীরে একজনই বানায়। তার নাম জানি। সে হীরেও আমি দেখেছি। কিন্তু তা অনেক ছোট, এত বিরাট নয়। মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিলাম, কথাটা বিশ্বাস হয়নি আমার।

স্থির চোখে সে দেখছিল আমার মুখের চিন্তা। এখন বললে, হীরের খবর অনেক রাখেন মনে হচ্ছে। আমার খবরটাও তাহলে শুনে রাখুন। শুনলে হয়তো কেনবার সাধ হবে। নদীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে পকেটে দুহাত পুরে ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাতের আগন্তুক, শোনবার পরেও যে আপনার বিশ্বাস হবে না একবর্ণও, তা জেনেও সব বলব আপনাকে।

একটু বিরতি দিয়ে আত্মকথা শুরু করেছিল মূর্তিমান রহস্য সেই অচেনা মানুষটা। সঙ্গে সঙ্গে পালটে গিয়েছিল কণ্ঠস্বর। এতক্ষণ গলার আওয়াজে ক্ষীণভাবে জড়িয়ে ছিল হাঘরেদের অমার্জিত সুর। এখন মনে হল যেন শিক্ষিত মানুষ কথা বলে যাচ্ছে মেপে মেপে–শব্দচয়ন এবং উচ্চারণের মধ্যে বৈদগ্ধ্য আর পাণ্ডিত্য উজ্জল হীরকের মতোই দ্যুতি বিকিরণ করে চলেছে।

সঠিক উপাদানের মিশ্রণ-প্রবাহে কার্বন ছিটিয়ে দিয়ে সঠিক চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই হীরে তৈরি করা যায়। কার্বন বেরিয়ে আসে ক্রিস্টালের আকারে-কালো সিসে বা কাঠকয়লা গুঁড়োর আকারে নয়, ছোট ছোট হীরের আকারে। বহু বছর ধরে এইটুকুই জেনে এসেছে কেমিস্টরা। মিশ্রণ-প্রবাহের সঠিক উপাদান কী হওয়া উচিত, কতখানি চাপ দেওয়া উচিত উক্তৃষ্ট হীরে বানানোর জন্যে, তা কিন্তু কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি, তাই কেমিস্টদের হাতে বানানো হীরে জহুরির কাছে দাম পায়নি, গয়নায় তার ঠাঁই হয়নি... পুঁচকে, কালচে কার্বনের ডেলার দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি। সেরা হীরে তৈরির এই মূল রহস্যটা নিয়ে আমি কিন্তু প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছি সারাজীবন। জীবনটাকেই ব্যয় করছি বলতে পারেন এর পেছনে।

কাজ শুরু করেছিলাম সতেরো বছর বয়সে। এখন আমার বয়স বত্রিশ। তখন মনে হয়েছিল দশ-বিশ বছরের মেহনত কিছুই নয়। মনের ভাবনাকে কাজে রূপ দেওয়াটাই একমাত্র ধ্যানধারণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, এত মেহনতের দাম একখানা মোমবাতিও নয়। অথচ দেখুন, রহস্যের চাবিকাঠি যদি হাতে এসে যায় কয়লার দামে হীরে বিকোবার আগে, তাহলে কোটি কোটি মুদ্রার মালিক হয়ে বসা যাবে রাতারাতি।

একুশ বছর বয়সে হাতে ছিল হাজারখানেক পাউন্ড। ভেবেছিলাম, ছেলে পড়িয়ে আর এই মূলধন নিয়ে চালিয়ে যেতে পারব গবেষণা। দু-এক বছর দিব্যি চালিয়েও গেলাম– বেশির ভাগই বার্লিনে। তারপর শুরু হল গবেষণা গোপন রাখার ঝামেলা। আইডিয়াটা একবার ফাঁস হয়ে গেলেই তো লোকে হেঁকে ধরবে আমাকে। এমন একখানা আইডিয়া মাথায় আনার মতো বুদ্ধিমান চেহারাখানাও দেখানো উচিত নয় পাঁচজনের কাছে। নকল হীরে টন-টন বানাতে পারি, এ কথা একবার জানাজানি হয়ে গেলে গবেষণা শিকেয়

উঠবে দুদিনেই। তাই কাজ চালাতে হল চুপিসারে-কাকপক্ষীকে না জানিয়ে। প্রথমদিকে নিজস্ব ছোট্ট ল্যাবরেটরি ছিল। হাতের পয়সা ফুরিয়ে আসার পর কেন্টিসটাউনে আমার জঘন্য নেড়া ঘরের মধ্যেই গবেষণা চালিয়ে গেলাম। যন্ত্রপাতির পাশে মেঝের ওপর লেপ-তোশক নিয়ে রাত কাটিয়েছি বছরের পর বছর। টাকা উড়তে লাগল খোলামকুচির মতো। খাওয়াদাওয়ার কষ্ট গায়ে মাখিনি–কিপটেমি করিনি কেবল যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাপারে। ছেলে পড়িয়ে দুপয়সা রোজগার করাটাও দেখলাম এক ঝকমারি ব্যাপার। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ডিগ্রি আমার নেই। কেমিস্ট্রি ছাড়া আর কোনও শাস্ত্র জানা নেই। তার ওপর, ছেলে-পড়ানো আমার ধাতে সয় না। সবচেয়ে বড় অসুবিধে, সময় নষ্ট। বেশ খানিকটা দামি সময় খরচ হয়ে যেতে লাগল গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানাতে গিয়ে। এত কষ্টের মধ্যেও কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমার লক্ষ্যের দিকে তিল তিল করে। তিন বছর আগে মিশ্রণ-প্রবাহের উপাদান বার করলাম, কতখানি চাপ দেওয়া দরকার, তা-ও বার করলাম। তারপর সেই মিশ্রণ-প্রবাহের সঙ্গে হিসেবমতো কার্বন উপাদান মিশিয়ে মুখবন্ধ বন্দুকের চোঙার মধ্যে ঢুকিয়ে, জল ভরে টাইট করে এঁটে গরম করতে লাগলাম।

খুবই ঝুঁকি নিয়েছিলেন, হীরের কারিগর একটু থামতেই বলেছিলাম আমি।

ঠিক কথা। ঝুঁকি না নিলে কিছু পাওয়াও যায় না। বিস্ফোরণ ঘটেছিল গান ব্যারেলেও। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল ঘরের সব কটা জানলা আর বেশ কিছু যন্ত্রপাতি। তা হোক। ফলও পেলাম কিছু। হীরের কিছু গুড়ো। গলিত উপাদান-মিশ্রণকে সঠিক চাপের মধ্যে কীভাবে রাখা যায়, এই সমস্যা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মাথায় এসে গেল সমাধানটা। প্যারিসে দব্রে গবেষণা করেছিলেন পেঁচিয়ে-আঁটা ইস্পাতের চোঙার মধ্যে ডিনামাইট

ফাটিয়ে। সাংঘাতিক সেই বিস্ফোরণের ধাক্কায় কঠিন পাথর কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছিল–চোঙা কিন্তু ফেটে উড়ে যায়নি। দক্ষিণ আফ্রিকায় হীরের খনিতে যেরকম কাদা দেখা যায়–এ কাদাও প্রায় সেইরকমই। পুঁজিপাটা তখন শূন্য। তা সত্ত্বেও অতি কষ্টে ওর নকশা অনুযায়ী ইস্পাতের চোঙা জোগাড় করলাম। বিস্ফোরক আর আমার যাবতীয় উপাদান ঠাসলাম তার ভেতর। গনগনে চুল্লি জ্বালোম ঘরের মধ্যে। চোঙা চাপিয়ে দিলাম জ্বলন্ত চুল্লিতে। দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম হাওয়া খেতে।

হো হো করে হেসে উঠেছিলাম বলার ভঙ্গিমা শুনে। এমন সহজভাবে শেষ কথাটা বলে গেল যেন আগুনের আঁচে বিস্ফোরক ভরতি সিলিন্ডার চাপিয়ে হাওয়া খেতে যাওয়াটা নিত্যনৈমিত্তিক কাজ–যেন কোনও ব্যাপারই নয়–রান্না চাপিয়ে গেল যেন কড়ায়।

হাসতে হাসতেই বলেছিলাম, সে কী! বাড়ি উড়ে যাবে যে! আর কেউ ছিল না বাড়িতে?

ছিল বইকী। নিচের তলায় ফলওয়ালা এক ফ্যামিলি, পাশের ঘরে চিঠি দেখিয়ে ভিক্ষে চাওয়ার একটি ভিখিরি, ওপরতলায় দুজন ফুলওয়ালি। ব্যাপারটা হঠকারিতা সন্দেহ নেই। হয়তো তখন কেউ কেউ বাড়ির বাইরেও গিয়েছিল।

ফিরে এসে দেখি, যেখানকার জিনিস সেখানেই রয়েছে–তেতে সাদা অঙ্গারের ওপর রাখা চোঙা ফেটে উড়ে যায়নি। বিস্ফোরক বাড়ি উড়িয়ে দেয়নি–সিলিন্ডার অটুট। সমস্যায় পড়লাম তারপরেই, বড় জবর সমস্যা। জানেন তো, ক্রিস্টালকে দানা বাঁধতে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট সময় দেওয়া দরকার। হড়বড় করলে ক্রিস্টাল হবে আকারে ছোট, অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে তবেই হবে বড়। ঠিক করলাম, আগুনের আঁচে দুবছর ফেলে রাখব চোঙা– আঁচ কমাব একটু একটু করে। পকেট তখন গড়ের মাঠ-কানাকড়িও নেই।

পেটে খাবার নেই, ঘরে কয়লা নেই–অথচ দু-দুটো বছর আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। সেই সঙ্গে জুটিয়ে যেতে হবে ঘরের ভাড়া।

পয়সার ধান্দায় হরেকরকম কাজ করতে হয়েছে এই সময়ে। লম্বা ফিরিস্তি। সব বলতে চাই না। এদিকে হীরে তৈরি হয়ে চলেছে, ওদিকে কখনও খবরের কাগজ ফিরি করছি, কখনও ঘোড়া ধরে দাঁড়িয়ে আছি, কখনও গাড়ির দরজা খুলে ধরে হাত পাতছি, বেশ কয়েক হপ্তা খামের ওপর ঠিকানা লিখে পেটের খাবার আর চুল্লির কয়লা কিনেছি। কবরখানায় মাটি নিয়ে যাওয়ার কাজও করেছি হাতগাড়ি ঠেলে–রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে খদ্দের ডাকতাম। একবার তো ঝাড়া একটা হপ্তা কোনও কাজ না পেয়ে স্রেফ ভিক্ষে করে কাটিয়েছি। সেই সময়ে একজনের ছপেনি ছুঁড়ে দেওয়ার ঘটনাটা জীবনে ভুলব না। দাক্ষিণ্যের অহংকার যে কী জিনিস, তা সেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। প্রতিটি পাইপয়সা। খরচ করতাম আগে কয়লা কিনতে খিদে চেপে রেখে।

শেষকালে ভাগ্যদেবী মুখ তুলে চাইলেন। তিন হপ্তা আগে আগুন নিবিয়ে দিলাম, আর কয়লা দিলাম না। সিলিন্ডার টেনে এনে প্যাঁচ খুলতে গিয়ে হাত ঝলসে ফেললাম। বাটালি দিয়ে চেঁচে ভেতর থেকে বার করলাম ঝুরঝুরে লাভার মতো বস্তু। লোহার পাতে রেখে গুঁড়ালাম হাতুড়ি মেরে, পেলাম তিনটে বড় আর পাঁচটা ছোট হীরে। মেঝের ওপর বসে যখন হাতুড়ি পিটছি, তখন দরজা ফাঁক করে উঁকি মেরে মাতাল প্রতিবেশী নোংরা হেসে বলেছিল, রত্ন তৈরি হচ্ছে বুঝি? মদে চুরচুর অবস্থা সত্ত্বেও ব্যাপারটা বার করে নিয়েছিলাম পেট থেকে। শয়তানটা থানায় খবর দিয়ে এসেছে। পুলিশ এল বলে। লাফিয়ে কলার খামচে ধরে ঘুসি মেরে তাকে শুইয়ে দিয়ে, হীরেগুলো শুধু পকেটে পুরে হাওয়া গেলাম তৎক্ষণাৎ। পুলিশ এল বলে–অ্যানার্কিস্ট পাকড়াও করতে পারলে আর

কিছু যারা চায় না, তাদের কোনওরকম সুযোগ দেওয়াও যায় না। সেইদিনই সন্ধের খবরের কাগজে আমার আস্তানাকে কেন্টিস বোমার কারখানা বলা হয়েছিল ফলাও করে। এখন কী ফাঁপরে পড়েছি দেখুন। এমন মায়া পড়ে গেছে হীরে কটার ওপর, পয়সার বিনিময়েও কাছছাড়া করতে প্রাণ চায় না। কিন্তু তা-ও এখন করতে হচ্ছে, পেটের জ্বালা এমন জ্বালা। কিন্তু যেখানেই যাই, সেখানেই সন্দেহ, সেখানেই জোচ্চুরি, সেখানেই গা-জোয়ারি। খুব নামকরা এক জহুরির দোকানে গেলাম। আমাকে বসতে বলে ফিসফিস করে কেরানিকে হুকুম দিলে পুলিশ ডেকে আনতে। আর কি বসি সেখানে? চোরাই মাল কেনাবেচা করে এমন একজনের কাছে গিয়ে পড়লাম আরও ঝামেলায়। একটা হীরে হাতে নিয়েই হাঁকিয়ে দিলে আমাকে। সে কী হুমকি! ফের যদি হীরের জন্যে ওমুখো হই তো আদালতে টেনে নিয়ে যাবে। কয়েক লাখ পাউন্ড দামের হীরে বোঝাই থলি গলায় ঝুলিয়ে টো-টো করছি রাস্তায় না আছে পেটে খাবার, না আছে মাথা গোঁজবার আস্তানা। আপনাকে দেখেই কী জানি কেন মনে হল, আর যা-ই করুন, ফাঁসিয়ে অন্তত দেবেন না। কাউকে যা বলিনি, তার সবই তা-ই বললাম আপনাকে। খুব কষ্টে দিন কাটছে। আপনার মুখ দেখে পছন্দ হয়েছে বলেই প্রাণ খুলে বলবার ভরসা পেলাম। এবার বলুন, কী করবেন।

বলে, সোজা আমার দিকে চেয়ে রইল সে।

আমি বললাম, দেখুন মশায়, এই পরিস্থিতিতে একখানা হীরে কেনাও আমরা পক্ষে বাতুলতা। সবচেয়ে বড় অসুবিধে, পকেটের মধ্যে হাজার হাজার পাউন্ড নিয়ে রাস্তায় ঘোরার মতো বড়লোক আমি নই। তবে হ্যাঁ, আপনার কথা একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছি না। এক কাজ করতে পারেন। কাল আসুন আমার অফিসে।

ধারালো গলায় তক্ষুনি বললে সে, চোর ঠাওরেছেন মনে হচ্ছে আমাকে? খবর দিয়ে রাখবেন পুলিশকে? না মশাই, ফাঁদে পা দিতে চাই না।

না, না, চোরাই মাল নয়। চোর আপনি নন, এ বিশ্বাসটা যেভাবেই হোক, এসে গেছে। মনের মধ্যে। তাহলে বরং যখন খুশি আসুন, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার দরকার নেই।

আমার কার্ড দিলাম, সেই সঙ্গে একটা আধ ক্রাউন।

বললাম, রাখুন, কাজে লাগবে।

সুদ সমেত ফিরিয়ে দেব দেনা। ঋণী থাকব না, এইটুকু শুধু বলে রাখলাম। সুদের পরিমাণটা শুনলে কিন্তু চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। যাক গে সে কথা, যা বললাম, তা পাঁচকান করবেন না আশা করি?

জবাবের জন্যে দাঁড়িয়ে না থেকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল হীরে কারিগর। দেখলাম, এসেক্স স্ট্রিটের দিকে তার ছায়ামূর্তি হেঁটে যাচ্ছে হনহন করে। বাধা দিলাম না। আর তাকে দেখিনি।

দুটো চিঠি পেয়েছিলাম পরে। ব্যাঙ্ক নোট পাঠাতে বলেছে বিশেষ একটা ঠিকানায়–চেক হলে চলবে না। ভেবেচিন্তে হঠকারিতার মধ্যে পা বাড়ানো সমীচীন বোধ করলাম না। একবার সে দেখা করতেও এসেছিল। আমি তখন ছিলাম না। চিনতে পেরেছিলাম চেহারার বর্ণনা শুনে। দারুণ রোগা, নোংরা, ছেঁড়া জামাকাপড়-পরা দর্শনার্থীর চোখ-নাক

ঠেলে বেরিয়ে আসছিল ভয়াবহ কাশির দমকে। চিঠিপত্র লিখে রেখে যায়নি, আমি নেই শুনেই চলে গেছে। সেই শেষ, এ কাহিনিতে আর তার আবির্ভাব ঘটেনি। জানি না সে সত্যই হীরে কারিগর, না নুড়ি জালিয়াতিতে পোক্ত। বদ্ধ উন্মাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। মাঝেমধ্যে কিন্তু মনে হয়, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছি। এমন সুযোগ জীবনে দুবার আসে না। কে জানে, এদ্দিনে হয়তো তার প্রাণপাখি উড়ে গেছে জীর্ণ খাঁচা ছেড়ে। নুড়ির মতো দেখতে হীরেগুলোকেও থলি সমেত টান মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে জঞ্জালের গাদায়। থলির মধ্যেকার একটা হীরের সাইজ কিন্তু আমার এই মোটাসোটা বুড়ো আঙুলের মতো বিরাট। নিজের চোখে দেখা, হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করা। এমনও হতে পারে, আজও সে হীরের বেসাতি করে বেড়াচ্ছে, খদ্দের খুঁজে যাচ্ছে বৃথাই। কেউ কর্ণপাতও করছে না অথবা হয়তো টাকার পাহাড়ে চড়ে বসেছে এদ্দিনে। মাতব্বর হয়েছে, কিন্তু টাকার বান্ডিলের দৌলতেই ভিড়ে গেছে কোটিপতিদের মেঘালয়ে, সাধারণ মানুষ খবর রাখে না সেই উচ্চমার্গের, নাগাল পাওয়া তো দূরের কথা, তাই আমি তার কোনও খবর না রাখলেও আমার খবর রাখে সে। মুচকি হাসি হাসে আমার দুরবস্থা দেখে। ঝুঁকি নিতে পারিনি সেদিন, মাত্র পাঁচ পাউন্ড যদি বার করতে পারতাম, আজ আমার টাকা খায় কে! দূর থেকে আজও হয়তো সে নীরবে ভর্ৎসনা করে চলেছে আমার এই অবিবেচক সত্তাটাকে।